গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

বর্ষ : ৩ | সংখ্যা : ৬ | আগস্ট ২০১২

শহীদুল্লা কায়সার

'আইয়ুব খান জেলে পাঠিয়েছিলেন, তাই আমি সাহিত্যিক হতে পেরেছি'- এই উক্তিটি যিনি করেছেন তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসেই লিখেছেন 'সারেং বৌ' নামের বিখ্যাত সেই উপন্যাসটি। যেটির জন্য তাঁকে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়। আর এই 'সারেং বউ' উপন্যাসটির স্রষ্টা শহীদুল্লা কায়সার। যিনি তিন পর্যায়ে আট বছর জেলে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন এবং জেল জীবনের এই দীর্ঘ সময়ে তিনি পড়াশুনা ও সাহিত্য চর্চা করেছেন নিবিষ্টমনে। 'সারেং বউ', 'রাজবন্দীর রোজনামচা' 'সংশপ্তক' ছাড়াও কারাগারে বসেই তিনি অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন।

শহীদুল্লা কায়সার জন্মগ্রহণ করেন ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামের সৈয়দ পরিবারে ১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী। বাবা মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্-এর প্রথম সন্তান আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লা, যাঁর সাহিত্যিক নাম 'শহীদুল্লা কায়সার'। শহীদুল্লা কায়সারের মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন ছিলেন মানবহিতৈষী একজন মানুষ। ১৪-১৫ বছর বয়সে মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মা সুফিয়া খাতুন স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশীয় কাপড় তৈরির ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার সাথে কাজ করেছেন। শহীদুল্লা কায়সারের মানস-গঠনে তাঁর মায়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন শহীদুল্লার রাজনীতি এবং সাহিত্যিক জীবনের প্রধান অনুপ্রেরণাদাত্রী।

মার কাছেই শহীদুল্লা কায়সারের পড়াশুনার হাতেখড়ি হয়। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার শুরু হয় নিজ গ্রাম মজুপুরের আমিরাবাদ বিদ্যালয়ে। একটু বড় হয়ে ওঠার পর মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। কলকাতায় আসার পর তাঁকে প্রথমে সরকারী মডেল স্কুলে এবং পরে মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার অ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে ভর্তি করা হয়। শহীদুল্লাহ কায়সার অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। এখানে তিনি প্রতি বছরই প্রথম স্থান অধিকার করে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণীতে ওঠেন এবং ১৯৪২ সালে ষোল বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি ভর্তি হন অবিভক্ত বাংলার সে সময়ের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'প্রেসিডেন্সি কলেজে'। ১৯৪৬ সালে তিনি এখান থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন এবং অর্থনীতিতে এম.এ. পড়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। একই সাথে তিনি রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) আইন বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। সেসময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল একই সাথে মেধাবী ছাত্র সৃষ্টির ও ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান। এ কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় শহীদুল্লা কায়সার বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন এবং ছাত্র ফেডারেশনের উৎসাহী সমর্থক ও কর্মী হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এসময়ই তিনি মার্কসবাদ-লেলিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ঢাকায় এসে শহীদুল্লা কায়সার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ. ভর্তি হন। ঢাকায় তিনি দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ঢাকায় আসার পর পূর্ববাংলার ছাত্রদের সংগঠিত করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হবার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে ১৯৪৭ সালে তিনি আত্মগোপন করেন এবং আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তিনি গোপনে গোপনে ছাত্রদের সংগঠিত করেন। আত্মগোপনে থাকার কারণে তাঁর এম.এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়নি ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন ও নিয়মিত ছাত্রজীবনের এখানেই ছেদ ঘটে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হওয়ার অভিযোগে মুসলিম লীগের হুলিয়ায় ১৯৫২ সালের ৩রা জুন তিনি প্রথম গ্রেফতার হন। এ থেকেই তাঁর কারাজীবনের সূচনা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার জন্য ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দশ বছরের মধ্যে নানা সময়ে তাঁকে আট বছর কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে জীবন কাটাতে হয়।

সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি শহীদুল্লা কায়সারের সাংবাদিক জীবন ছিল অনন্য। ১৯৫৬ সালে কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পরিচালিত 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় তিনি যোগদান করেন। এভাবেই শহীদুল্লা কায়সারের সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক আইন জারি হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ১৪ই অক্টোবর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জননিরাপত্তা আইনে তাঁকে এ পর্যায়ে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আটক রাখা হয়। এ সময় তাঁর কারাবাসের সাথী ছিলেন খোন্দকার গোলাম মুস্তফা, রওশন আলী প্রমুখ। ১৯৬২ সালে পূর্ববাংলায় প্রবল ছাত্র-আন্দোলনের ফলে অন্যান্যদের সাথে শহীদুল্লা কায়সারও কারাগার হতে মুক্ত হন। মুক্তি লাভ করেই তিনি 'দৈনিক সংবাদ'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন।

'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' পত্রিকা থেকে সাংবাদিক জীবনের হাতেখড়ি হলেও তাঁর সাংবাদিক জীবনের সমস্ত কৃতিত্ব ও পরিচিতি 'দৈনিক সংবাদ'-কে ঘিরে আবর্তিত। এখানে চাকরিকালে শহীদুল্লা কায়সার প্রবীণ ও খ্যাতনামা সাংবাদিক-সাহিত্যিক জহুর হোসেন চৌধুরী, সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত প্রমুখের সাহচর্যে আসেন। ফলে তাঁর চিন্তাস্রোত ও লেখালেখির পরিসর বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে আপন কর্ম-দক্ষতায় এ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক পদে উন্নীত হন। তিনি একাধারে মেধাবী, মননশীল, সৎ, আদর্শবাদী ও নির্ভীক সাংবাদিক ছিলেন। সাংবাদিকতার কাজে তাঁর অসম্ভব রকম একাগ্রতা ছিল। তিনি যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করলেও তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতার জন্য ক্রমে পত্রিকাটির সব দায়দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। তিনি 'সংবাদ'-এর মধ্যমণিতে পরিণত হন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের মধ্য রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা বংশালে অবস্থিত 'সংবাদ'-এর অফিস ভবনটি পুড়িয়ে দেয়ার পরও তিনি তা পুনঃপ্রকাশের চেষ্টা করেন।

তিনি একাধিকবার প্রাদেশিক তথা পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন ও সাংবাদিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সুযোগ্য নেতৃত্ব দেন।

'সংবাদ'-এর সম্পাদকীয় বিভাগের নির্দিষ্ট লেখা ছাড়াও তিনি 'দেশপ্রেমিক' ও 'বিশ্বকর্মা' ছদ্মনামে যথাক্রমে সমকালীন দেশীয় রাজনীতির নানা প্রসঙ্গ নিয়ে প্রায় চার বছর ধরে 'রাজনৈতিক পরিক্রমা' এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম- ইতিহাস-বিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়ে 'বিচিত্র-কথা' শীর্ষক দুটি কলাম 'সংবাদ'-এ লিখতেন। এই কলাম দুটি সাধারণ মানুষের কাছে উপভোগ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তাঁর প্রথম কারাবাসকালে ১৯৫২-৫৫ সালে জেলখানায় রাজবন্দি থাকা অবস্থায় তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন। চট্টগ্রাম জেলে তিনি ১৯৫২ সালে 'নাম নেই' এবং ১৯৫৪ সালে 'যাদু-ই-হালুয়া' রচনা করেন। তাঁর বিপ্লবী জীবন-দর্শন সদৃশ 'সংশপ্তক' উপন্যাসের সূতিকাগার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। তৃতীয় পর্যায়ের কারাবাসকালে ১৯৫৯-১৯৬২ সালের মধ্যে উপন্যাসটি তিনি লিখেছেন এবং ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে এটি প্রকাশিত হয়। সংশপ্তক তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস। তবে তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। 'কৃষ্ণচূড়া মেঘ' (১৯৫৯), 'দিগন্তে ফুলের আগুন' (১৫ আগস্ট, ১৯৬১), 'কুসুমের কান্না' (২৬-১-১৯৬২ থেকে ১৪-৬-১৯৬২), চন্দভানের কন্যা (অসম্পূর্ণ) উপন্যাসগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন বিচিত্র শিল্পী-মনের অধিকারী। তিনি যেমন বিচিত্র বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, তেমনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে লিখেছেন। তাঁর সাংবাদিক জীবনের গ্রন্থ 'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ' ১৯৬৬ সালে রচিত ও প্রকাশিত হয়। এটি ১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারি তাসখন্দ নগরে অনুষ্ঠিত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার চুক্তি বা বৈঠকের রোজনামচা; ভ্রমণ কাহিনী জাতীয় রচনাও বটে। এটি লেখকের চতুর্থ বা শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ।

এছাড়া কারাজীবনে তিনি অসংখ্য কবিতা, গল্প, রম্য রচনা, চিঠিপত্র এবং নিয়মিত ডায়েরি লিখেছেন। কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে বাদ দিলে চিঠিপত্র বা ডায়েরির সাহিত্যমূল্য নগণ্য নয়।

শহীদুল্লা কায়সারের বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্প-প্রবন্ধ অপ্রকাশিত ছিল। দুটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস তাঁর আছে। তবে এসব রচনার অধিকাংশই তিনি কারাগারের লোহার ফটকের অভ্যন্তরে লিখেছেন। 'কবে পোহাবে বিভাবরী' কারাগারের বাইরে লেখা তাঁর একমাত্র উপন্যাস। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি এটি রচনা করেন। শহীদুল্লা কায়সার 'কবে পোহাবে বিভাবরী' উপন্যাসটি লেখা শুরু করেন মুক্তিযুদ্ধের সময়। বইখানি চারটি খন্ডে সমাপ্ত করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু দু'খন্ড লেখার পর বইটি অসমাপ্ত থেকে যায়। এ উপন্যাসটিতে মুক্তিযুদ্ধকালে পাক-বাহিনীর অত্যাচার ও ধ্বংসলীলার চিত্র এঁকেছেন তিনি বিরাট এক ক্যানভাসে। মুক্তিযুদ্ধের অস্থিতিশীল ও প্রতিকূল সময়ে শহীদুল্লা কায়সার এই উপন্যাসটি লিখেছেন। চারদিকে হত্যা, ধ্বংস, অগ্নিসংযোগের মধ্যে রাত জেগে তিনি এই উপন্যাসটি লিখতেন। ভোর হবার সাথে সাথে পান্ডুলিপি মাটির তলায় পুঁতে রাখতেন কায়েতটুলির বাড়িতে। রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থান থেকে পান্ডুলিপি উঠিয়ে নিয়ে আসতেন এবং ডুবে যেতেন লেখার মধ্যে। এটি তাঁর শেষ রচনা।

১৯৫৬ সালে জহির রায়হানের (১৯৩৫-১৯৭২) সম্পাদনায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাপ্তাহিক 'প্রবাহ' প্রথম প্রকাশিত হয়। মাত্র নয়টি সংখ্যা প্রকাশের পর 'প্রবাহ' বন্ধ হয়ে যায়। এ পত্রিকার সাথে শহীদুল্লাহ কায়সার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। মোহাম্মদ শহীদুল্লা নামে 'প্রবাহ' পত্রিকায় তাঁর অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

শহীদুল্লা কায়সার ১৯৫৮ সালে কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য জোহরা বেগম-এর সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ১৯৬১ সালে তাঁদের আইনানুগ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি শহীদুল্লা কায়সার পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রী পান্না চৌধুরী বিবাহকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন মাত্র। প্রায় তিন বছরের দাম্পত্য জীবনে এক কন্যা সন্তান ও এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। কন্যা শমী কায়সার এবং পুত্র অমিতাভ কায়সার।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের অনেকে দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন, আবার অনেকে ঢাকা তথা দেশের মধ্যেই আত্মগোপন করেছিলেন। 'সংবাদ' অফিস ভস্মীভূত হওয়ার পর শহীদুল্লা কায়সারের ভারতে যাবার ডাক আসে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বার বার তাঁকে নিয়ে যেতে লোক আসে। এরপর কমরেড মণি সিংহ 'আর এখানে থাকা সঙ্গত নয়'- এ কথা জানিয়ে তাঁর কাছে পত্র লেখেন এবং লাল কালিতে তা নিম্নরেখ করে দেন। রাশিয়ান দূতাবাসও বার বার তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ব্যর্থ হয়। কিন্তু শহীদুল্লা কায়সার দেশ ছেড়ে যাননি। কারণ তিনি ভাবেন সবাই দেশ ছেড়ে গেলে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য করবে কে? আর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্যই রয়ে গেলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে অনেকেই সুফিয়া কামালের কাছে রেশন কার্ড রেখে যান। সুফিয়া কামাল সেইসব রেশন কার্ড দিয়ে চাল, ডাল, ঔষধসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তুলে এনে তাঁর বাসায় জড়ো করতেন এবং পরে শহীদুল্লা কায়সারকে খবর দিতেন। শহীদুল্লা কায়সার সেসব জিনিস মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। তাঁর দেশ ত্যাগ না করার আরও একটি কারণ মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ চিত্র নিজে প্রত্যক্ষ করে তা ইতিহাসে বিধৃত করা। কিন্তু অবশেষে তিনি নিজেই ইতিহাসে পরিণত হয়েছেন।

১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা। পুরান ঢাকার কায়েতটুলির বাসায় শহীদুল্লা কায়সার মোমবাতি জ্বালিয়ে বিবিসি শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। স্ত্রী পান্না কায়সার মেঝেতে বসে মেয়েকে ফিডারে দুধ খাওয়াচ্ছেন। এমন সময় দরজায় ঠক ঠক করে কড়া নাড়ার শব্দ হল। তাঁর ছোট ভাই ওবায়দুল্লা এসে শহীদুল্লাহ কায়সারকে বললেন, 'বড়দা দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে, খুলে দিব?' তিনি উৎফুল্লভাবে বলে উঠলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা এসেছে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দাও।' একথা বলে তিনি আলমারি খুলে টাকা বের করলেন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পর মুক্তিযোদ্ধারা নয় চার-পাঁচজন লোক কাল কাপড়ে মুখ ঢেকে ঘরে প্রবেশ করল। তারা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, 'শহীদুল্লা কায়সার কে?' শহীদুল্লাহ কায়সার এগিয়ে এসে বললেন, 'আমিই শহীদুল্লা কায়সার।' সেই কাল কাপড়ে মুখ ঢাকা লোকগুলি তাঁর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে যেতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে পান্না কায়সার মেয়ের দুধের ফিডার ছুড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীর হাত চেপে ধরলেন, অন্য ঘর থেকে শহীদুল্লা কায়সারের বোন ছুটে এসে ভাইয়ের হাতটি চেপে ধরলেন। কিন্তু তাঁরা শত শক্তি প্রয়োগ করেও ধরে রাখতে পারলেন না স্বামী ও ভাইকে। আল-বদররা স্ত্রী ও বোনের হাতের বাঁধন ছিন্ন করে ধরে নিয়ে গেল তাঁকে। শহীদুল্লা কায়সার যাবার সময় স্ত্রী ও বোনের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বলেছিলেন, 'ভাল থেকো'। কারফিউ-এর অন্ধকারে তিনি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলেন। তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এমনকি তাঁর মৃতদেহও পাওয়া যায়নি। ■

তথ্যসূত্র:

সরিফা সালোয়া ডিনার লেখা বই 'শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস বিচিত্র বীক্ষণ' থেকে নেয়া হয়েছে। প্রকাশক : কমল কান্তি দাস, প্রকাশনা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০০৮। স্ত্রী পান্না কায়সারের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

লেখক : মৌরী তানিয়া

সম্পাদকীয়

আমাদের দেশে অনেক গুণী ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা সারাজীবন তাঁদের সৃজনশীল চিন্তা, মনন ও মেধা দিয়ে শান্তি, মানবতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন ও করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের লেখনী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করছেন। অনেকে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির এইসব গুণী ব্যক্তিবৃন্দকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করার একটি প্রয়াস 'গুণীজন' ট্রাস্টের। 'গুণীজন' ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.gunijan.org.bd.

'গুণীজন' ওয়েব জার্নালে (www.gunijan.org.bd) রয়েছে আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের (শিক্ষা, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, গণমাধ্যম, নারী অধিকার অন্দোলন, মুক্তিসংগ্রাম ইত্যাদি) গুণীজনদের বেড়ে ওঠার গল্প, বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র, সমসাময়িক বিষয় নিয়ে তাঁদের অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার। এছাড়া আরো রয়েছে গুণীজনদের লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

'গুণীজন' ট্রাস্ট মূলত স্বেচ্ছাশ্রম ও ব্যক্তিপর্যায়ের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত, কোন বিদেশী দাতাসংস্থার অর্থে পরিচালিত নয়। বিভিন্ন দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগে ধীরে ধীরে আগ্রহ প্রকাশ করছে ও সহায়তা করছে।

যেহেতু বাংলাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটছে ধীর গতিতে, তাই সিডি প্রকাশ ও স্কুল কর্মসূচিসহ বিভিন্ন মাধ্যমে 'গুণীজন'-এর প্রসার বাড়ানোর প্রয়াস চলছে। গুণীজন প্রকাশিত সিডিগুলো হলো- 'মহিমা তব উদ্ভাসিত', 'মহিমা তব উদ্ভাসিত- মুক্তিযুদ্ধ খণ্ড-১', 'মহিমা তব উদ্ভাসিত- মুক্তিসংগ্রাম'। সিডিগুলো পাওয়া যাবে- বনানীর অরণ্য ক্রাফটস লিমিটেডে, আজিজ সুপার মার্কেটের সুরের মেলা, বিসিএল সিডি কর্ণার ও পাঠশালায়; আইডিবি ভবনের ইপসিতা কম্পিউটারস-এ এবং হুমায়ুন রোডের ডি.নেট কার্যালয়ে।

স্কুল কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকার বাইরে শিশু-কিশোরদের কাছে গুণীজনবৃন্দকে পরিচয় করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একাজে ডি.নেটের গ্রামীণ স্কুল ভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষা কর্মসূচি ও খেলাঘরের সাথে গুণীজন স্কুল কর্মসূচি যৌথভাবে কাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, বাংলা ভিশন, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ, রহিম আফরোজ বাংলাদেশসহ আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানাভাবে গুণীজন কর্মসূচিকে সহযোগিতা করেছে এবং করছে।

আপানারা জেনে আনন্দিত হবেন যে 'গুণীজন' কর্মসূচিটি 'ওয়ার্ল্ড সামিট অ্যাওয়ার্ড ২০০৯'-এ বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে। সারা পৃথিবী থেকে নমিনেশন প্রাপ্ত ৬০টিরও বেশী কর্মসূচির মধ্যে ই-কালচার এন্ড হেরিটেজ বিভাগে 'গুণীজন' কর্মসূচির স্থান ছিল ষষ্ঠতম। মনথন অ্যাওয়ার্ড, ২০০৮-এ গুণীজন কর্মসূচি মনোনয়ন পেয়েছিল।

'গুণীজন' কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ও ঢাকার বাইরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করার জন্য চার জন (আবুল হোসেন, মুনীর চৌধুরী, আবু ইসহাক ও শহীদুল্লাহ কায়সার) গুণীজনের জীবনী নিয়ে 'গুণীজন' নামক পত্রিকাটির ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

গুণীজনদের পরিচিতি দেশব্যাপী বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হলো 'গুণীজন' নামক পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য।

সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'গুণীজন' পত্রিকাটির যাত্রা শুভ হোক। নতুন প্রজন্মের মাঝে গুণীজনদের পরিচিতি ছড়িয়ে দেয়ার যে উদ্যোগ 'গুণীজন' নিয়েছে তা সফল হোক, এই প্রত্যাশা রইলো সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে। ■

আবু ইসহাক

প্রথম দিকে খুব বেশি দূর যেতে চাননি তিনি। লিখতে বসেছিলেন বিশেষিত শব্দের ছোটখাটো একটা অভিধান। লিখতে লিখতে তিরিশ বছর কেটে গেল। কখন কেটে গেল টেরই পেলেন না। নিজের বিশাল কাজ দেখে পরে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। শেষ দিকে এসে এ কাজে পুরো পরিবার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

কাজটাও বেশ অদ্ভুত। নানা ধরনের বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা চষে শব্দ বের করতেন। শব্দগুলো ছোট ছোট কার্ডে লিখে নিতেন। কার্ডগুলো রাখতেন গুঁড়ো দুধের খালি কৌটায়। পরে সেগুলো বাছাই করে সুতোয় মালা গেঁথে সাজাতেন। এই মালা গাঁথার কাজ ও বিশেষিত শব্দের কার্ড গুছিয়ে দিতেন স্ত্রী, কন্যা, পুত্র ও নাতি-নাতনিরা। এভাবে দুই লাখেরও বেশি বিশেষিত শব্দ নিয়ে মালা গাঁথলেন তিনি। শব্দের এই মালাগুলো পুস্তক আকারে রূপ নিয়ে হল বাংলা ভাষার মূল্যবান সম্পদ 'সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান'। শুধু এই অভিধানই নয় আরো অনেক কিছু রচনা করেছেন আবু ইসহাক। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলোর একটির নাম আবু ইসহাক। বাংলা সাহিত্যে যাঁরা লিখেছেন কম, কিন্তু যা লিখেছেন তা অসাধারণ, তাঁদেরই একজন তিনি। সব মিলিয়ে তিনটি উপন্যাস, ছোটগল্পের দুটি সংকলন, একটি নাটক, একটি স্মৃতিকথা ও একটি অভিধান রচনা করেছেন আবু ইসহাক। এর বাইরে অগ্রন্থিত আরও কিছু রচনা আছে। মাত্র ২০ বছর বয়সে লেখা প্রথম উপন্যাস 'সূর্যদীঘল বাড়ী' দিয়ে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যসমাজে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন আবু ইসহাক।

১৯২৬ সালের ১ নভেম্বর শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানাধীন শিরঙ্গল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আবু ইসহাক। তাঁর বাবা মৌলভী মোহাম্মদ এবাদুল্লাহ ও মা আতহারুন্নিসা। ছয় ভাইবোনের মধ্যে আবু ইসহাক ছিলেন পঞ্চম।

আবু ইসহাকের বাবা ছেলে-মেয়েদের মানসিক বিকাশের কথা চিন্তা করে তিনি ওই সময়ের বিখ্যাত দুটি বাংলা সাময়িকপত্রের গ্রাহক হয়েছিলেন। নিয়মিত গ্রাহক হওয়ায় 'সওগাত' ও 'দেশ' পত্রিকা নিয়মিত পেতেন আবু ইসহাক ও তাঁর ভাইবোনেরা। সম্পন্ন ও সংস্কৃতিমনা পরিবার ও স্কুলের লাইব্রেরিতে পত্রপত্রিকা ও পুস্তক পাঠের সুযোগ শৈশব ও কৈশোরে সাহিত্যিক আবু ইসহাকের মানস গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। ছোটবেলা থেকেই কবিতা ও গল্প লেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন আবু ইসহাক।

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায়ই আবু ইসহাক গল্প ও কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর এসব লেখার বেশকিছু স্কুলের দেয়াল পত্রিকা 'প্রভাতি'-তে ছাপা হয়েছে। স্কুলের গণ্ডির বাইরে তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় নবম শ্রেণিতে পড়ার সময়। মাত্র ১৪ বছর বয়সে কলকাতা থেকে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নবযুগ' পত্রিকায় ছাপা 'অভিশাপ' নামের সেই গল্পটিই তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এটিই আবু ইসহাকের প্রথম প্রকাশিত লেখা। ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময় 'সওগাত' ও 'আজাদ' পত্রিকায় তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি গল্প ছাপা হয়। ওই সময় কলেজ বার্ষিকীতে তাঁর অনুবাদ করা একটি কবিতাও ছাপা হয়েছিল।

১৯৪২ সালে শরীয়তপুর জেলার উপসী বিজারী তারাপ্রসন্ন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং ১৯৪৪ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেন আবু ইসহাক। পারিবারিক আর্থিক সংকট ও রাজনীতিবিদদের উৎসাহে পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই আবু ইসহাক চাকরিতে যোগ দেন। বাংলা সরকারের বেসরকারি সরবরাহ বিভাগের পরিদর্শকের চাকরি নিয়ে তিনি চলে আসেন নারায়ণগঞ্জে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় আবু ইসহাকের কর্মস্থল ছিল পাবনা। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। দেশভাগের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হয়ে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বেসরকারি সরবরাহ বিভাগ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। আবু ইসহাককে আত্মীকরণ করা হয় পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সরকারি চাকুরেদের অনেকের পদোন্নতি ঘটলেও আবু ইসহাকের ক্ষেত্রে ঘটে পদাবনতি। আগে ছিলেন পরিদর্শক, পুলিশ বিভাগে আত্মীকরণের পর হন সহকারী পরিদর্শক। একই পদে থেকে যেতে হয় দীর্ঘ আট বছর। এই চাকরিতে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আবু ইসহাকের কর্মস্থল ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা।

১৯৫৬ সালে তাঁর ভাগ্যে পদোন্নতি জোটে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগের পরিদর্শক করে তাঁকে করাচিতে বদলি করা হয়। ১৯৬০ সালে চাকরিরত অবস্থায় করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করেন তিনি। এরপর আবু ইসহাকের বেশ কয়েক দফা দ্রুত পদোন্নতি ঘটে। ১৯৬৬ সালে তাঁকে রাওয়ালপিন্ডিতে বদলি করা হয়। ১৯৬৯ সালে সহকারী কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে তাঁকে করাচি থেকে বদলি করা হয় ইসলামাবাদে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত তিনি ইসলামাবাদেই ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে না থাকলেও বাঙালি হওয়ার কারণে আবু ইসহাককে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচার চেষ্টায় লড়তে হয়েছে তাঁকে। পাকিস্তানে আটকে পড়া অবস্থা থেকে আবু ইসহাক বহু কষ্টে পালিয়ে যান আফগানিস্তানে। ভারত ও আফগানিস্তান সরকারের সহায়তায় ১৯৭৩ সালে কাবুল ও নয়াদিল্লি হয়ে দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হন তিনি। দেশে ফেরার পর বাংলাদেশের নবগঠিত নিরাপত্তা বিভাগ তাঁকে যথার্থ সম্মানের সাথে বরণ করে নেয়। তাঁকে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) উপপরিচালক করা হয়। এর পরে ১৯৭৪ সালে তিনি মিয়ানমারের আকিয়াব শহরে বাংলাদেশ কনসুলেটে ভাইস কনসাল হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৭৬ সালে আবু ইসহাক কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮৯ সালে তাঁকে আবার বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং এনএসআই'র খুলনা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। চাকরি জীবনের শেষ পর্যায়ে খুলনার খালিশপুর এলাকায় 'সূর্যদীঘল বাড়ী' নামে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন আবু ইসহাক। আবু ইসহাক ২০০৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকার মীরপুরে বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন আবু ইসহাক।

আবু ইসহাক দাম্পত্যজীবন শুরু করেন ১৯৫০ সালে। পাকিস্তানে থাকার সময় স্ত্রী সালেহা ইসহাক ছিলেন ইসলামাবাদ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের শিক্ষিকা। দেশে ফেরার পর শিক্ষকতা করেছেন মতিঝিল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। আবু ইসহাক ও সালেহা ইসহাক দম্পতির তিন সন্তান।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের দেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। পাকিস্তানে 'বাঙালি রিপ্যাট্রিয়েশন কমিটি'র কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। পাকিস্তানের জেলে আটকে পড়া বাঙালিদের ছাড়িয়ে আনার জন্য আইনি সহযোগিতা থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার সাধ মতো চেষ্টা করেছেন আবু ইসহাক। আবু ইসহাকের শখ ছিল মাছ ধরা, শিকার করা এবং মৌমাছি পালন। এছাড়া আড্ডাপ্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। করাচিতে থাকাকালীন সমমনা পড়ুয়া বাঙালিদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন প্রবাসী পাঠচক্র। পাঠচক্রের সদস্যদের বাসায় প্রতিমাসে চক্রাকারে আড্ডা বসত।

বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য আবু ইসহাক ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮১ সালে আবু ইসহাককে সুন্দরবন সাহিত্য পদক দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক লাভ করেন। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন তিনি। ২০০৬ সালে আবু ইসহাক নাটক বিভাগে শিশু একাডেমী পদক পান। এছাড়া অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

আবু ইসহাকের উপন্যাস ও গল্পের অনুবাদ এবং সেগুলো অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র দেশের বাইরে থেকে দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্যদীঘল বাড়ী' উর্দু ও চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। উপন্যাসটির উর্দু অনুবাদ 'আসেবি ঘর' ১৯৬৯ সালে হাবিব ব্যাংক সাহিত্য পদক লাভ করে। 'সূর্যদীঘল বাড়ী' অবলম্বনে ১৯৭৯ সালে চলচ্চিত্রকার মসিহউদ্দিন শাকের একই নামে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন সেটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কারসহ সাতটি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাঁচটি পুরস্কার লাভ করে। আবু ইসহাকের লেখা 'মহাপতঙ্গ' গল্প অবলম্বনে ইংরেজি ভাষায় নির্মিত কার্টুন ছবি 'হু ফ্লিউ ওভার দ্য স্প্যারো'স নেস্ট' সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ১৯৮১ সালের চলচ্চিত্র উৎসবে মানবিক আবেদন সৃষ্টির জন্য শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর বেসরকারি সরবরাহ বিভাগের পরিদর্শকের চাকরি নিয়ে আবু ইসহাক প্রথম কাজ শুরু করেন নারায়ণগঞ্জে। নারায়ণগঞ্জ তখন দুর্ভিক্ষ কবলিত। বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির খপ্পরে পড়ে দেশের অধিকাংশ মানুষই তখন বাঁচার আশায় দিশেহারা। নারায়ণগঞ্জে থাকার সময় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের ট্রেনের একশ্রেণির যাত্রীর মধ্যে এই দিশেহারাদের দেখেছিলেন আবু ইসহাক। যারা নিঃস্ব হয়ে পেটের ভাত জোগাড়ের আশায় শহরে গিয়েছিল, কিন্তু শহরে কোনো ভরসা না পেয়ে তারা গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে ফিরেও তারা বাঁচার আশ্বাস পায় না। এইসব দিশেহারা, নিঃস্ব, অসহায় মানুষদের নিয়ে আবু ইসহাক নারায়ণগঞ্জে থাকাকালেই ১৯৪৪ সালে তাঁর প্রথম ও অন্যতম উপন্যাস 'সূর্যদীঘল বাড়ী' রচনার কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ চার বছর পর ১৯৪৮ সালে এটি লেখার কাজ শেষ হয়। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এটি ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় 'নওবাহার' নামক মাসিক পত্রিকায়। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় রচনার সাত বছর পর ১৯৫৫ সালে। প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে এবং পরে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। 'সূর্যদীঘল বাড়ী'-তে এমন অনেক কিছুই আছে যা দেশে ও বিদেশে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আবু ইসহাকের দ্বিতীয় উপন্যাস 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। 'পদ্মার পলিদ্বীপ' লেখা শুরু করেছিলেন ১৯৬০ সালে এবং শেষ করেন ১৯৮৫ সালে। এটি প্রথমে বাংলা একাডেমীর পত্রিকা 'উত্তরাধিকার'-এ প্রকাশিত হয় 'মুখরমাটি' নামে। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এটির নাম রাখা হয় 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ অর্থাৎ দেশভাগের আগের সময়কে এ উপন্যাসে ধারণ করা হয়েছে। পদ্মার বুকে জেগে ওঠা নতুন চরের দখল নিয়ে এ উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে।

আবু ইসহাকের তৃতীয় ও সর্বশেষ উপন্যাস 'জাল'। ১৯৮৮ সালে 'আনন্দপত্র' নামের একটি পত্রিকার ঈদসংখ্যায় এটি প্রথম ছাপা হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এর পরের বছর। প্রকাশের দিক থেকে তৃতীয় উপন্যাস হলেও এটি লেখা হয় ১৯৫০-এর দশকে। এটি লেখার সময় পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে আবু ইসহাক কয়েকটি জাল নোটের মামলার তদন্ত করছিলেন। শোনা যায়, 'সূর্যদীঘল বাড়ী' প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেই তিনি গোয়েন্দা কাহিনীর আদলে লিখেছিলেন 'জাল'। পরে 'সূর্যদীঘল বাড়ী' এতটাই আলোড়ন তোলে যে তিনি নিজের নামের প্রতি অবিচার হতে পারে ভেবে 'জাল'কে প্রকাশ না করে বাক্সবন্দি করে রাখেন দীর্ঘ ৩৪ বছর।

আবু ইসহাকের সঙ্গে সাহিত্যের পাঠকের পরিচয় তাঁর গল্পের মাধ্যমে। তবে দীর্ঘ সাহিত্য জীবনের তুলনায় তাঁর গল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ মাত্র দুটি 'হারেম' (১৯৬২) ও 'মহাপতঙ্গ' (১৯৬৩)। ২০০১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'স্মৃতিবিচিত্রা'কে অনেকেই গল্প সংকলন হিসেবে বিবেচনায় আনেন। 'স্মৃতিবিচিত্রা'য় আসলে তিনি নিজের জীবনের স্মৃতিই তুলে ধরেছেন নকশাধর্মী রচনার আদলে।

আবু ইসহাক রচিত একমাত্র নাটক 'জয়ধ্বনি'। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে তিনি এটি রচনা করেন। বাংলা একাডেমীর কিশোর পত্রিকা 'ধানশালিকের দেশ'-এ এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। নাতি-নাতনিদের আবদারে তিনি এটি রচনা করেন। মীজানুর রহমানের 'ত্রৈমাসিক পত্রিকা'র পক্ষী সংখ্যায় ১৯৮৮-৮৯ সালে প্রকাশিত 'একটি ময়নার আত্মকাহিনী' নামে তাঁর লেখা গল্প এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে এ নাটকে। আবু ইসহাকের অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যাও খুব বেশি নয়।

আবু ইসহাকের অভিধান চর্চার একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ১৯৬২ সালে চাকরি সূত্রে তিনি পাকিস্তানের করাচিতে ছিলেন। ওই সময়ে করাচিতে বাঙালিদের সাহিত্য সংগঠন প্রবাসী পাঠচক্রের একটি মাসিক সাহিত্যসভার আয়োজন ছিল আবু ইসহাকের বাসায়। ওই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি তখন পাকিস্তান সরকারের উর্দু ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের পরিকল্পনাধীন উর্দু ভাষার অভিধান প্রণয়নের জন্য উর্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে নিয়োজিত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা একাডেমীর পরিকল্পনাধীন আঞ্চলিক ভাষার অভিধান নিয়ে তখন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার সঙ্গে আবু ইসহাকের আলোচনা হয়। ড. এনামুল হকের নেতৃত্বে বাংলা একাডেমী তখন ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের কাজ করছে। ওই দিন আবু ইসহাক কথায় কথায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে বাংলা ভাষায় বিশেষণে বিশেষিত একটি অভিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ওই আলোচনায় ড. শহীদুল্লাহ বলেন, 'করতে পারলেতো ভালোই হয়। তবে আমার বয়সে তা সম্ভব নয়।... যদি কেউ করতে পারে তবে ভালো কাজ হবে বলে মনে করি। তবে অভিধানের নামে যেন ওয়ার্ডবুক না হয়।'

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এসব কথাই আবু ইসহাকের মনে নাড়া দিয়ে যায়। ওই দিনই তিনি বিশেষণে বিশেষিত বাংলা শব্দের একটি অভিধান প্রণয়নের ব্যাপারে মনে মনে সংকল্প করেন। ১৯৯৩ সালের জুনে বাংলা একাডেমী থেকে অভিধানটির প্রথম অংশ (স্বরবর্ণ) প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮ সালে বাংলা একাডেমী 'সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান'-এর ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ (ক থেকে ঞ) প্রকাশ করে। বিশাল এই অভিধানের বাকি অংশ প্রকাশে উদ্যোগী ছিল বাংলা একাডেমী। আবু ইসহাকের আকস্মিক মৃত্যুতে অভিধানের কাজ মাঝপথে থেমে যায় এবং বাকি অংশগুলো প্রকাশে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। আবু ইসহাক তাঁর এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। পুরো অভিধানের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি হতো বলে ধারণা করেছিলেন আবু ইসহাক। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আমাদের এ রকম একটি বিশাল প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: আবু ইসহাকের জীবন ও কর্ম নিয়ে এ লেখার জন্য সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে আবু ইসহাকের রচনাগুলো থেকে। এছাড়া নাঈম হাসান সম্পাদিত 'নিরন্তর' (ষষ্ঠবর্ষ, শীত সংকলন, পৌষ ১৪১২) পত্রিকায় প্রকাশিত ড. স্বরোচিষ সরকারের 'আবু ইসহাকের সাহিত্যচর্চা আবু ইসহাকের অভিধান চর্চা' রচনাটি বিশেষ সহায়ক হয়েছে। গ্রন্থ হিসেবে সহায়ক হয়েছে বিকাশ মজুমদারের 'আবু ইসহাক: সমাজ বাস্তবতার কথাকার' (বলাকা, চট্টগ্রাম, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৬)। সর্বোপরি তথ্য ও অন্যান্য সহযোগিতা দিয়েছেন আবু ইসহাকের পুত্র মুশতাক কামিল। ■

লেখক: ষড়ৈশ্বর্য মুহম্মদ

সম্পাদক
উর্মি লোহানী

প্রকাশক
গুণীজন ট্রাস্ট

মুদ্রণে
পাথওয়ে

অলংকরণ
মোঃ শাহজাহান কাজী

যোগাযোগ
৬/৮ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল : info@gunijan.org.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.gunijan.org.bd
ফোন ঃ +৮৮০২৮১৫৬৭৭২, +৮৮০১৮১৪৬৫২৪৯৬-৭
ফ্যাক্স ঃ +৮৮০২৮১৪২০২১

মুনীর চৌধুরী

১৯৫২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি কারাগারের যে কক্ষে বন্দি ছিলেন সেখানে অন্য রাজবন্দিদের মধ্যে ছিলেন মোজাফ্ফর আহমদ, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অজিত গুহ, মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ও শেখ মুজিবুর রহমান আর অন্য কক্ষে ছিলেন রণেশ দাশগুপ্তসহ ষাট-সত্তর জন কমিউনিস্ট। দেখতে দেখতে একবছর গড়িয়ে ১৯৫৩ সাল এল। কমিউনিস্ট বন্দিরা জেলে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করতে চাইলেন। রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর পূর্বপরিচিত এবং রাজনৈতিক অঙ্গনের সহকর্মী ছিলেন। তাই সবাই রণেশ দাশগুপ্তকে ধরলেন তাঁকে অনুরোধ করতে, তিনি যেন ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে একটা নাটক লিখে দেন। রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর কাছে গোপনে চিঠি পাঠালেন, জেলখানায় করার মতো একটি নাটক লিখে দেয়ার জন্য। নারী চরিত্র থাকলেও পুরুষ যেন তা করতে পারে সেভাবে। রণেশ দাশগুপ্ত তাঁকে জানালেন রাত ১০টার পর আলো নিভে গেলে নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। তিনি নারী চরিত্র ছাড়াই জেলখানার মধ্যে বসেই রচনা করলেন একটি নাটক। যেসব ছাত্রবন্দী রাতে হারিকেন জ্বালিয়ে লেখাপড়া করে তাদের ৮/১০টি হারিকেনের আলোয় মঞ্চ সাজিয়ে তাঁর লেখা নাটকটি সেদিন মঞ্চস্থ হয়েছিল।

এই নাটকটিই হলো ২১-এর অমর নাটক 'কবর'। আর এটিই ভাষা আন্দোলনের একমাত্র নাট্য দলিল। রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে জেলখানায় বসেই যিনি এই নাটকটি লিখেছিলেন তিনি হলেন মুনীর চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পাবন্ধিক ও নাট্যকার মুনীর চৌধুরী। যাঁকে মায়ের বাড়া গরম ভাত রেখে পাকিস্তানি হায়নাদের দোসর এদেশের রাজাকার, আলবদরদের সাথে চলে যেতে হয়েছে চিরতরের জন্য। মায়ের বাড়া সেই ভাত খেতে আর কোনোদিন ফিরে আসেননি তিনি।

পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান মুনীর চৌধুরীকে চিঠি পাঠিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি যেন রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কাজে জড়িত না হোন। স্ত্রী লিলি চৌধুরী ও তিন ছেলে ভাষণ, মিশুক, তন্ময়কে নিয়ে তিনি তখন ফুলার রোডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টারে থাকেন। চিঠি পাওয়ার পর সবদিক বিবেচনা করে গিয়ে উঠলেন সেন্ট্রাল রোডের পৈত্রিক বাড়িতে। তার দেড়মাস পরের ঘটনা...

সেন্ট্রাল রোডের দারুল আফিয়া। সকাল এগারোটার দিকে মুনীর চৌধুরী গোসল সেরে ভালো করে গা মোছেননি পর্যন্ত। পিঠ দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে কোমরের পিছন দিকে লুঙ্গিটা ভিজে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে মাকে খাবার দিতে বলেছেন। খেয়েই বেরুবেন কোথাও। তাড়াহুড়া করছেন।

দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর। দেশ স্বাধীন হওয়ার আর মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা বাকি। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী মিলে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে পাক সেনাদের। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রকে বঙ্গোপসাগরের নির্দিষ্ট জল সীমানা অতিক্রম না করার জন্য সাবধান করে দিয়েছে। রাও ফরমান আলী মার্কিন মুল্লুকের কর্ণধারদের সাথে যোগাযোগ করে আরজি জানিয়েছেন, পাক সৈন্যদের বাংলাদেশ থেকে ভালোয় ভালোয় চলে যাবার ব্যবস্থা করে দিলে ওরা নাকি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবে। খবর পাওয়া যাচ্ছিল গত দুই দিন ধরেই - দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হানাদারমুক্ত, স্বাধীন। সবার চোখ তখন নতুন এক স্বপ্নে বিভোর। দেশ স্বাধীন হবে। নতুন মানচিত্র, নতুন পতাকা, নতুন দেশ হবে। দেশটির নাম হবে 'বাংলাদেশ'।

মা ছেলের জন্য ভাত বেড়েছেন। গরম ভাত থেকে ধোঁয়া উড়ছে। চুল না আঁচড়িয়েই খেতে বসতে যাবেন মুনীর চৌধুরী। ঠিক এই সময় একটা জিপ বাসার গেটে এসে থামল। জিপের আরোহীদের সবারই কালো কাপড় দিয়ে মাথা ও মুখ ঢাকা, চোখ দুটো কেবল দেখা যায়, চিনবার কোনো উপায় নেই। কয়েকজন জিপ থেকে নেমে অনুমতির অপেক্ষা ছাড়াই বাসায় ঢুকে সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে একজন বলল, 'আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে, আমাদের কমান্ডার আপনাকে যেতে বলেছেন।' কথা শুনে মুহূর্তেই একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল পরিবারের সবার মাঝে। মুখঢাকা মানুষগুলোর কথা শুনে মা আগলে দাঁড়ালেন পথ। কিছুতেই যেতে দিবেন না ছেলেকে। ওদের একজন তখন বলল, 'আপনারা শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন, আমাদের কমান্ডারের সাথে দেখা করে এখুনি তিনি ফিরে আসবেন। আমরাইতো দিয়ে যাব।' লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা ছিল তাঁর। পাজামা-পাঞ্জাবি পরতে ঘরের ভেতরে যেতে চাইলে সাথে সাথেই মুখঢাকা একজন বলে উঠল, 'আর কিছুই গায়ে দিতে হবে না স্যার। আপনি কেবল যাবেন আর আসবেন।' এক মুহূর্ত ভাবলেন তারপর বললেন, 'ঠিক আছে চলুন।' বেরিয়ে গেলেন কালো কাপড় দিয়ে মুখঢাকা ওদের সাথে, যারা তাঁকে একেবারে নিয়ে যেতে এসেছিল। পেছনে রেখে গেলেন মায়ের বাড়া গরম ভাত, মা, ভাইবোন, বিশ্ববিদ্যালয়, সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, স্ত্রী আর প্রিয় উত্তরাধিকার। আর ফিরে এলেন না তিনি। খুঁজেও পাওয়া যায়নি মুনীর চৌধুরীকে আর কোনোদিন।

মুনীর চৌধুরী জন্মেছিলেন ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহকুমা মানিকগঞ্জের একটি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে। মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান মুনীর। বাবা আব্দুল হালিম চৌধুরী ছিলেন বংশের প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। বদলির চাকরি ছিল তাঁর। মুনীরের জন্মের সময় পেশাগত কারণেই আব্দুল হালিম চৌধুরী তখন পরিবার নিয়ে মানিকগঞ্জে। চাকরি করার কারণে তাঁর ব্যস্ততা থাকলেও নিজের পড়াশোনা ও ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার খোঁজখবর নিতে এতটুকু ঘাটতি ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল প্রচুর দেশি-বিদেশি বই। মুনীর চৌধুরীর বয়স যখন চৌদ্দ তখন বাবা আব্দুল হালিম চৌধুরী তাঁকে সাতাশ খণ্ডের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা এনে দেন। মুনীর চৌধুরীর মা আফিয়া বেগম। তিনিও প্রচুর বই পড়তেন।

মুনীর চৌধুরীসহ তাঁর চৌদ্দজন ভাইবোনদের শিক্ষাদীক্ষার পেছনে বাবার বিশাল ভূমিকা থাকলেও ধৈর্যশীলা, মমতাময়ী এই মা তাঁর সব ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ অর্জনের প্রেরণা জুগিয়েছেন। নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপন করলেও মুনীর চৌধুরীর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে দেশের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরে। অনেকটা গ্রামীণ পরিবেশেও।

তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চার শুরু বগুড়া থেকে। তারপর পিরোজপুরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪১ সালে মুনীর চৌধুরী ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকেই প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। বাল্যকাল থেকেই অসাধারণ মেধাবী ছিলেন মুনীর। তবে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় মনোযোগী তিনি কখনোই ছিলেন না। পাঠ্যবইয়ের ছকবাঁধা পাঠ্যক্রম তাঁকে কখনোই আকর্ষণ করেনি। বাল্যকাল থেকেই ছিলেন প্রচণ্ড দুরন্ত স্বভাবের। কৈশোরে এসে তা আরো বেড়ে যায়। তখনই স্কুল ফাঁকি দেয়া ও স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখায় যথেষ্ঠ অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। স্কুল জীবনের শেষ দুটি বছর তাঁকে সিনেমার নেশায় পেয়ে বসেছিল। সে সময়ে ঢাকার ব্রিটানিয়া সিনেমা হলে গিয়ে ইংরেজি সিনেমাই বেশি দেখতেন মুনীর।

যে বছর তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন সে বছরেই তাঁকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আই.এস.সি.-তে ভর্তি করানো হয়। মুনীরের স্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য ও ঔদাসিন্যতার দিক বিবেচনা করেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবা চিন্তা করলেন, এখান থেকে আই.এস.সি. পাশ করার পর ছেলেকে তিনি ডাক্তারি পড়াবেন। যদিও শেষপর্যন্ত বাবার সে আশা পূর্ণ হয়নি। তবে পারিবারিক বিধিনিষেধ ও শৃঙ্খলা ছেড়ে আলীগড়ে এসে মুনীর জীবনের আর এক নতুন স্বাদ পান। ফলে আরো স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠেন মুনীর। ক্লাসের পড়াশোনায় মন না থাকলেও সে সময় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল লাইব্রেরিই হয়ে ওঠে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রধান আকর্ষণ। তখনই বিশ্বের বিখ্যাত লেখকদের রচনার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে।

বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে মুনীরের আগ্রহ একেবারেই ছিল না। তার উপর সিলেবাসের বাইরে পড়াশোনা, নিয়মিত আড্ডা, বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়ানো, সবকিছু মিলিয়ে ক্লাসের পড়াশোনায় ব্যাপক ঘাটতি পড়ে তাঁর। যে কারণে আই.এস.সি. চূড়ান্ত পরীক্ষায় দুই বিষয়ে পরীক্ষা না দিয়ে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ছেলের এমন খেয়ালি সিদ্ধান্তে বাবা আব্দুল হালিম ক্ষুব্ধ ও হতাশ হন। তবে মেধার জোরে দেয়া পরীক্ষাগুলো ভালো হয়েছিল বলেই অপ্রত্যাশিতভাবেই মুনীর ১৯৪৩ সালে আই.এস.সি.-তে দ্বিতীয় বিভাগ নিয়ে পাশ করেন। সে বছরেই নিজের আগ্রহ ও বড় ভাই কবীর চৌধুরীর প্রেরণায় মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনার্স-এ ভর্তি হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর মুনীর চৌধুরীর জীবন কিছুটা অন্যদিকে বাঁক নিল। নতুন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট, নতুন অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে তাঁর শিক্ষা ও ব্যক্তিজীবন আরো সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেল। প্রতিভাদীপ্ত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ ছেলেগুলো তাঁকে আকর্ষণ করল। তাঁদের মেধা আর প্রজ্ঞা তাঁকে মুগ্ধ করল। রবিগুহ, দেবপ্রসাদ, মদন বসাক, সরদার ফজলুল করিম প্রত্যেকেই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি উজ্জ্বল মুখ।

এখানে এসেও পড়ুয়া হিসেবে মুনীর চৌধুরীর নাম ছিল বেশ। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হয়েও কোনোদিন মেকি ভাব ধরেননি বরং আলীগড়ি পোশাক পাল্টে পাজামা-পাঞ্জাবি পরেছেন। সাইকেল চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। এখানেও সেই একই অবস্থা ক্লাসের পড়াশোনায় মন নেই। তবে শেকসপিয়র, বার্নার্ড শ, চার্লস ডিকেন্স, ভিক্টোর হুগো, টলস্টয় তাঁর পড়া শেষ। এ সময়েই তিনি বামপন্থি রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়েই মুনীর চৌধুরী সাহিত্যচর্চা, নাট্যকর্ম, রাজনীতি একই সাথে চালিয়ে যান। তখনই রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রগতিশীল লেখক ও রাজনীতিকদের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৯৪৩ সালে তিনি ঢাকার বামপন্থী সংগঠন 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এ যোগ দেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ ও রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়াও এ সংঘের উদ্যোগে ফ্যাসিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন তিনি। মুনীর চৌধুরী তখন এই সংঘের সক্রিয় কর্মী। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সাহিত্য প্রতিযোগিতায় তিনি সর্বাধিক পুরস্কারও লাভ করেন।

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে খুব বেশি সক্রিয় থাকার কারণে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার ফল তেমন ভালো হয়নি। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল ভালো না হলেও তাঁর বন্ধু এবং শিক্ষকরা তাঁর মেধা, পড়াশোনা ও জানার প্রশংসা করতেন। এরই মধ্যে উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা আমূল পাল্টে গেছে। সাম্প্রদায়িক খড়্গ দিয়ে ভাগ করা হয়েছে ভারতকে। জন্ম হয়েছে পাকিস্তান নামের এক নতুন রাষ্ট্রের। পাকিস্তানের আবার দুই ভাগ, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের পর এ ভূখণ্ডে (পূর্ব পাকিস্তানে) নতুন করে শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ। ফলে রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ তখনও অধিকার বঞ্চিত, নিপীড়িত।

ষড়যন্ত্র চলছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রথম ছাত্রসভা হয় সেখানে তিনি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। ১৯৪৮ সালে মুনীর চৌধুরী 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং এই বছরেই তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে যোগ দেন। এ সময় বাবার সাথে তাঁর মতের পার্থক্য ও কিছুটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। আব্দুল হালিম চৌধুরী সরকারি চাকরি করার কারণেই তাঁর সীমাবদ্ধতা ছিল অনেক। যে কারণে মুনীর চৌধুরী ও তাঁর ছোট বোন নাদেরা বেগমের বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ বাবা আব্দুল হালিম চৌধুরী কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তাছাড়া তাঁর ছেলে-মেয়েরা রাজনীতি করুক এটা তিনি কোনো সময়ই চাননি। বাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল সুবোধ অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মতোই তাঁর ছেলে-মেয়েরা কেবল পড়াশুনা করবে, শিক্ষিত হবে, মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু আব্দুল হালিম চৌধুরী নিষেধ করার পরও যখন দুই ভাই বোনকে রাজনীতি থেকে ফেরাতে পারলেন না তখন তাঁদের লেখাপড়ার খরচ দেয়া তিনি বন্ধ করে দিলেন। এসময় মা আফিয়া বেগম ও বড় ভাই কবীর চৌধুরী তাঁদের নানাভাবেই সহযোগিতা করতেন।

এক পর্যায়ে মুনীর রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়লেন। তখন বাবার সাথে তাঁর সম্পর্কের যতটুকু অবনতি হয়েছিল সেটাও এক সময় স্বাভাবিক হয়ে গেল। তখন তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হলেন আর প্রচুর পড়াশুনা করতেন। এ সময় মুনীর চৌধুরী মূলত প্রবন্ধই বেশি লিখেছেন। তাঁর প্রধান রচনাগুলো মূলত এ পর্বের।

১৯৪৯ সালে মুনীর চৌধুরী খুলনার দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে খুলনায় চলে গেলেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি সংসার জীবনও শুরু করলেন এ বছরেই। সংস্কারমুক্ত পরিবারের আধুনিক, শিক্ষিত ও শিল্পী লিলি চৌধুরীকে বিয়ে করলেন। লিলি চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। এ সময় মুনীর চৌধুরী রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কারাবরণ করলেন।

জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর মুনীর চৌধুরী ১৯৫০ সালে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এরপর মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগের ইংরেজি ও বাংলার খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই বিভাগেই ছিলেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ইংরেজি বিভাগের অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও ছাত্রজীবনে অর্জিত রাজনৈতিক চেতনা থেকে দূরে সরে যাননি তিনি। তখন ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আর মুনীর চৌধুরী ভাষা আন্দোলন ও স্বাধিকার আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী।

মুনীর চৌধুরী তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ কার্যক্রম থেকে সরে এলেও অধিকার আদায়ের প্রত্যেকটি আন্দোলনেই তাঁর মৌন ও পরোক্ষ সমর্থন ছিল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে ছাত্র-শিক্ষক-জনতার মিছিল শুরু হয়েছে। হঠাৎ শুনতে পেলেন গুলির শব্দ, সাথে সাথেই পাগলের মতো ছুটে গেলেন তিনি। এর পরের দিন অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি ভাষা রক্ষার মিছিলে গুলিবর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভার আহ্বান করা হয়েছিল। মুনীর চৌধুরী ছিলেন এ প্রতিবাদ সভার প্রধান উদ্যোক্তা ও বক্তা। এই ঘটনায় তখনই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং পাকিস্তান সরকারের বৈরী দৃষ্টিতে পড়লেন তিনি এবং ১৯৫২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে মুনীর চৌধুরীকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়।

কারাগারে থাকা অবস্থাতেই মুনীর চৌধুরী ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ সালে বাংলায় এম.এ. প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করলেন। তিন বছর কারাগারে থাকার পর ১৯৫৫ সালে মুনীর চৌধুরী কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্ত হয়ে মুনীর চৌধুরী এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবং এক বছরের ব্যবধানে স্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করলেন। স্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর মুনীর চৌধুরী সাহিত্য ও নাট্যচর্চায় অনেক বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠেন এবং দুই বছর প্রচুর পড়াশোনা করে ১৯৫৮ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. করলেন। সে সময়টায় তিনি বিদেশি সাহিত্য, বিশেষ করে নাটকের উপর পড়াশুনার ব্যাপক সুযোগ পান। দেশে ফিরে এসে আবার তিনি শিক্ষকতা শুরু করলেন। এ সময়টায় মুনীর চৌধুরী লেখা ও মঞ্চ নাটক নির্মাণেই বেশি সময় দিয়েছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধও লিখেছেন অনেক।

১৯৬২ সালে মুনীর চৌধুরী প্রভাষক থেকে রিডার পদে উন্নীত হন এবং এই বছরেই নাটকের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি জাপানের টোকিওতে নাট্যসম্মেলনে যোগ দিতে গেলেন এবং ফিরে এসে ঢাকা আর্টস কাউন্সিলের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। কিছুদিন পর 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'ভ্রান্তিবিলাস' নাটক প্রযোজনা করলেন। ১৯৬৫ সালে মুনীর চৌধুরী গবেষণা সাহিত্যের জন্যে দাউদ পুরস্কার এবং ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত সিতারা-ই-ইমতিয়াজ পুরস্কার লাভ করলেন।

১৯৬৭ সালের জুন মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করলে মুনীর চৌধুরী এর লিখিত প্রতিবাদ জানান। এছাড়াও তিনি বাংলা ভাষা ও লিপির বিকৃতি কিংবা অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সতর্ক এবং সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদকে সম্পাদক করে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন। কমিটি সরকারি চাহিদা মতো রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু এই কমিটির তিনজন বিশেষজ্ঞ অধ্যক্ষ মুহম্মদ আব্দুল হাই, ডক্টর এনামুল হক ও মুনীর চৌধুরী লিপি সংস্কারের বিরোধিতা করে আরেকটি রিপোর্ট উত্থাপন করলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল তখন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের নেতৃত্বে সংস্কার কমিটির রিপোর্টটি বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মুনীর চৌধুরী তখন যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান।

১৯৬৮ সালে মুনীর চৌধুরী যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পান তখন বাংলার রাজনীতির উত্তাল সময়, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। ১৯৭০ সালে তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করলেন।

১৯৭১ সালে তিনি কলা অনুষদের ডিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক সেমিনারে যোগ দিয়ে দেশে ফিরলেন। বাংলাদেশ তখন এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। অসহযোগ আন্দোলন চলছে। মুনীর চৌধুরী পাকিস্তান সরকারের দেয়া সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব বর্জন করলেন। চারদিকের অবস্থাটা তখন এমন, যে কোনো সময় কিছু একটা ঘটতে পারে। মুনীর চৌধুরী তা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। ঘটলও তাই, ঢাকার বুকে নেমে এল ২৫ মার্চের কালো রাত, হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হলো।

২৬ মার্চ ঘোষণা করা হলো স্বাধীনতা। শুরু হলো সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা যখন বাঙালির দোড়গোড়ায়, যখন স্বাধীনতা অর্জনের আর মাত্র ২ দিন বাকি, তখন আরো অনেকের মতো মুনীর চৌধুরীকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর ফিরে আসেননি তিনি। পাকিস্তানি জানোয়ারদের পরিকল্পনা ছিল স্বাধীনতার পরও যেন এ জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এ জাতিকে মেধাশূন্য করাই ছিল পাকিস্তানি নরপশুদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু মুনীর চৌধুরী তাঁর অসমাপ্ত কর্ম জীবনে যা রেখে গেছেন তা আজো আমাদের আলোর পথ দেখায়। ■

তথ্যসূত্র :

রশীদ হায়দার সম্পাদিত 'শহীদ বুদ্ধিজীবি কোষগ্রন্থ', বাংলা একাডেমী: ঢাকা, 'আমার বাবা' নামে লেখা ছেলে আসিফ চৌধুরীর লেখা থেকে, ফেরদৌসি মজুমদারের মুনির চৌধুরি সম্পর্কে আলোচনা, মুনীর চৌধুরীকে নিয়ে লেখা বড় ভাই কবির চৌধুরীর বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে।

লেখক : পিয়াস প্রান্তিক

গুণীজন
আমাদের প্রেরণার উৎস
www.gunijan.org.bd

বর্ষ : ৩ | সংখ্যা : ৬ | আগস্ট ২০১২

আবুল হোসেন

"তৃতীয় শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে ওঠার সময় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় অনেকগুলো বই উপহার পেয়েছিলাম। 'যখের ধন', 'ঝিলে জঙ্গলে', 'লালকালো'। আরও দু-তিনটি বই। একটা বাদে সবগুলো বই ছিল দেখতে চমৎকার, সুন্দর ঝকঝকে ছাপা, ভেতরে ছবি। একটা বই শুধু চোখে ধরেনি। প্রথমেই রঙচঙা ছবিওয়ালা বইগুলো পড়ে ফেললাম। তারপর সেই সাদামাটা বইটা হাতে নিলাম। পাতলা হলদে মলাটের ওপরের দিকে বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা 'সোনার তরী'। নিচে লেখকের নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেখি গল্প বা জীবজন্তুর কথা কিংবা অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী নয়, গদ্যও নয়, বইটা পদ্যের। পড়ে ফেললাম প্রথম কবিতার প্রথম লাইন-

'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা'

পড়তেই মনের মধ্যে এমন আলোড়ন শুরু হল, বুকের মধ্যে আবেগ এমন ঠেলে ঠেলে উঠছিল, আমি প্রায় এক নিঃশ্বাসে সমস্ত কবিতাটা পড়ে ফেললাম। পড়া শেষ হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কী ছিল ওই কবিতায়? যা ছিল ওই বয়সে তা বোঝার নয়। ছবিটা দেখেছিলাম ঠিকই। মেঘ ডাকছে, বৃষ্টি পড়ছে, নদীতে অনেক পানি, মাঝি নৌকা বাইছে। ছবিটা খুবই সুন্দর। কিন্তু না, ছবিটার জন্য নয়। আমি ভেসে গিয়েছিলাম শব্দের ঝঙ্কারে। ওই যে, গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা-র গ, ঘ, র-এর ডম্বরু, ওরা আমাকে কোথায় যেন নিয়ে গেল। কোথায় তা জানি না। শুধু বুঝতে পারি ভেতরে ভেতরে কী একটা হচ্ছে। কে এই রবীন্দ্রনাথ? তিনি কি আমাদেরই মতো মানুষ? কী করে তিনি আমাকে এমন বিহ্বল করে ফেললেন? ইচ্ছে করলে সব মানুষই কি তা করতে পারে? আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমি কি পারব? সেই থেকে আমি খাতার পর খাতা হিজিবিজি লিখে ফেলি, যদি কোন দিন আমারও হয়। কবিতা লেখার সেই শুরু।" ছেলেবেলায় রবী ঠাকুরের 'সোনার তরী' পড়ে শব্দের ঝঙ্কারে ভেসে যাওয়া কবি আবুল হোসেন স্তব্ধ হয়ে ভেবেছিলেন, আমি কী পারব? হ্যাঁ তিনি পেরেছিলেন। আর পেরেছিলেন বলেই আমাদের তিনজন প্রধান আধুনিক মুসলমান বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে আবুল হোসেনের প্রথম কবিতার বই 'নব বসন্ত' বের হয়েছিল সবার আগে, ১৯৪০ সালে। এরপর একে একে বের হয়েছে তাঁর অনেক বই। আর এই বইগুলিই তাঁকে আমাদের কাছে বিশিষ্ট ও অন্যতম কবিতে পরিণত করেছে।

বাগেরহাটের ফকিরহাট থানার আড়ুয়াভাঙা গ্রামে নানাবাড়িতে কবি আবুল হোসেনের জন্ম। শ্রাবণের এক বৃষ্টিহীন সকালে তাঁদের জন্ম হয়। তাঁদের বলতে আবুল হোসেন আর তাঁর এক বোনের। তাঁরা দুই ভাইবোন একত্রে এই পৃথিবীতে আসেন। মায়ের মুখে শুনেছেন, সামান্য একটু আগে-পরে তাঁদের জন্ম হয়। প্রথমে বোন, তারপর তিনি। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি খুলনা জেলার বর্তমান রূপসা থানার দেয়াড়াগ্রামে। তাঁর শৈশব কেটেছে এই গ্রামে।

ছেলেবেলায় সকালে খেয়েদেয়ে বই-শ্লেট বগলে নিয়ে একা একা পাঠশালায় পড়তে যেতেন। দেয়াড়ায় বাড়ি থেকে বের হয়ে বাঁ দিকের বড় রাস্তা ধরে তিনি হেঁটে পাঠশালায় যেতেন। বড় রাস্তা হলেও বিরাট সে রাস্তায় লোকজন বিশেষ চোখে পড়ত না। দুই দিক থেকে এসে গাছের ডাল ঝুলতো পথের ওপর। চারপাশে ঝোপঝাড়, ঝিঁঝি পোকার শব্দ শোনা যেত। কোথায় তারা বোঝা যেত না। ঝোপ থেকে একটা কাঠবিড়ালী বেরিয়ে অবাক হয়ে দেখত তাঁকে।

উঠোনে খেলার সময় চারদিকে ঢিল ছোড়া ছিল তাঁর এক বাতিক। ঢিল ছুড়ে আম পাড়েন, জামরুল আর কাঁঠাল জখম করেন। তাঁর বুজান দৌড়ে গিয়ে কাঁচা আম আর থেঁতলে যাওয়া জামরুল কুড়োন। একদিন বিকেলে এ রকম ঢিল ছোড়া মকশো করছিলেন রান্নাঘরের পাশে ফজলি আম গাছে। আম ছাড়াও ডালের সঙ্গে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা মৌচাকও ছিল, তিনি তা জানতেন না। মৌচাকে ঢিলটা লাগতেই ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি এসে তাঁর মাথায়-মুখে-হাতে-পায়ে ছেকে ধরল। তিনি তখন এই হঠাৎ আক্রমণে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তাঁর চিৎকারে বাড়িতে যে যেখানে ছিলেন সবাই ছুটে এলেন। ফুফু তাঁকে কোলে তুলে এক দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সারা রাত তাঁর যন্ত্রণা হয় খুব। মুখ-চোখ ফুলে ওঠে। প্রচণ্ড জ্বর হয়। সেই জ্বর ছাড়ে, তিন সপ্তাহ পরে। এভাবেই গ্রামের অবাধ প্রকৃতির মাঝে বেড়ে উঠেছেন কবি আবুল হোসেন।

তিনি ১৯২৯ সালে সাত বছর বয়সে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। সাড়ে সাত বছর কৃষ্ণনগরে থাকার পর তাঁর বাবা বদলি হন কুষ্টিয়ায়। আবুল হোসেন ভর্তি হলেন কুষ্টিয়া হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে। ১৯৩৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেন কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে। পাস করার পর ভর্তি হলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এ.-তে। ১৯৪২ সালে অর্থনীতিতে অনার্স পাস করেন তিনি। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. ক্লাসে পড়েন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসেবেই। যদিও সাহিত্যই ছিল তাঁর চিরদিনের আরাধ্য বিষয় এবং তার চর্চা শুরু করেছিলেন সেই ছেলেবেলা থেকেই। কিন্তু তারপরও তিনি অর্থনীতি পড়েছিলেন নিজের ইচ্ছায় নয়, বাবা-মাকে খুশি করার জন্য। তাঁরা মনে মনে আশা পোষণ করতেন তাদের ছেলে সিভিল সার্ভিসে যাক।

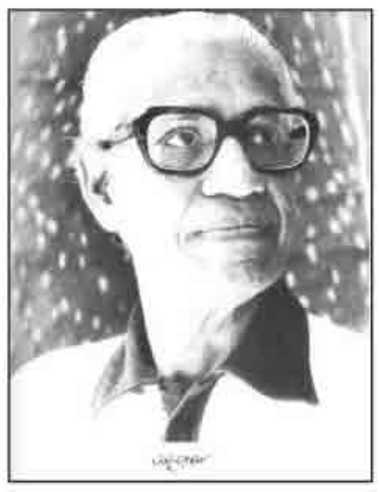

'৪৬-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বিদ্রোহ করল বোম্বাইয়ে নৌসেনারা। সন, তারিখ আবুল হোসেনের মনে থাকে না। কিন্তু নৌবিদ্রোহের এই তারিখটা তিনি কখনও ভোলেননি। কেননা ওই দিনে তিনি প্রথম সরকারি চাকরিতে যোগ দেন, কলকাতা আয়কর কমিশনারের অফিসে, এক্‌জামিনার অব অ্যাকাউন্টস পদে। দুটি কারণে এই চাকরিটা পেয়ে খুশি হয়েছিলেন তিনি। এক. এই পদের মাইনে ছিল ৩৫০-৪৬০ টাকা। তখন সরকারি কলেজের লেকচারাররা পেতেন ১২৫-৩৫০ টাকা। দুই. তাঁকে কলকাতার বাইরে কখনও যেতে হবে না। দ্বিতীয় কারণটাই ছিল আসল। তিনি কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাননি। কারণ তখনই ঠিক করে নিয়েছেন সাহিত্য চর্চাই হবে তাঁর আসল কাজ এবং তার জন্য কলকাতাই সবচেয়ে ভাল জায়গা।

দেশ ভাগের প্রাক্কালে আয়কর কমিশনারের অফিসে এক্‌জামিনার অব অ্যাকাউন্টস পদটি উঠে যায়। তিনিসহ সাত জন এই পদে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিভাগীয় পরীক্ষা দিয়ে আয়কর অফিসার হয়ে যান। বাকিদের পরিদর্শকের পদ দেওয়া হয়। আবুল হোসেন পরীক্ষা দেননি। কারণ তখন দেশ বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছে এবং কলকাতাতে থাকা যখন আর সম্ভব হচ্ছে না তখন এই আয়কর বিভাগে চাকরি করার ইচ্ছেও তাঁর চলে গেছে। কিন্তু তারপরও তাঁকে ময়মনসিংহে আসতে হলো সহকারী বিক্রয় কর অফিসার হিসেবে। তবে দুই-আড়াই বছর পর তিনি ঢাকার রেডিও পাকিস্তানে একটা সমপর্যায়ের চাকরিতে যোগ দেন '৫০ সালের মাঝামাঝিতে। এরপর তাঁকে ব্যাংককে সিটো পাবলিক ইনফরমেশন অফিসে ইন্টারন্যাশনাল স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেখান থেকে দেশে ফিরে তিনি জনসংযোগ বিভাগে যোগ দেন এবং সবশেষে ১৯৮২ সালে যুগ্মসচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

কবি আবুল হোসেন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যকরী পরিষদ,পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ও বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। রবীন্দ্র চর্চাকেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন এবং তিনি বাংলা একাডেমীর ফেলো।

১৯৫৮ সালে তিনি প্রখ্যাত লেখক আকবর উদ্দিনের জ্যেষ্ঠ কন্যা সাহানার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের বিয়ে ঠিক করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। আবুল হোসেন-সাহানা দম্পতির দুই ছেলে, দুই মেয়ে। ১৯৯৪ সালে তাঁর স্ত্রী সাহানা ইন্তেকাল করেন।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সাহিত্য তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হলেও সাহিত্য কী তখন তিনি তা ভালভাবে জানতেনই না। ছেলেবেলা থেকেই বই হাতে পেলেই পড়ে ফেলতেন। স্কুলে প্রথম দিকে ঝোঁক ছিল গল্পের বই পড়ার, নানা রকমের গল্প, পৌরাণিক গল্প, ইতিহাসের গল্প, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, রহস্যের গল্প, ভূতের গল্প, হাসির গল্প। সব বই মূল লেখকের নয়, বিদেশী লেখকের বইয়ের অনুবাদও পড়তেন। আর লেখালেখিরওতো শুরু সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। সেসময় বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয়দের মধ্যে বিতরণের জন্য পুস্তিকা বেরোত। তাতে মজা করে লিখত বরকনের নিকটজনেরা। তাঁর বড় বোনের বিয়েতেও একটি পুস্তিকা বের হয় এবং তিনি সেই পুস্তিকার জন্য জীবনের প্রথম কবিতাটি লিখলেন। কীভাবে কীভাবে যেন কবিতাটি গিয়ে পড়ল তাঁর স্কুলের বাংলা শিক্ষক চারুবাবুর হাতে। চারুবাবু বাংলা পড়াতেন। তাঁর মেজাজ কড়া। গলা হেঁড়ে। তাঁর ক্লাসে ভয়ে কেউ টুঁ শব্দটিও করত না। কবিতাটি হাতে নিয়ে ক্লাসে গম্ভীর হয়ে চারুবাবু সেটি পড়লেন। পড়া শেষ করে আঙ্গুলের ইশারায় ডাকলেন আবুল হোসেনকে। আবুল হোসেনের বুকে তখন ঢাকের বাদ্য বাজছে। কিন্তু চারুবাবুর গলায় ঝরে পড়ল অনিঃশেষ স্নেহ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা তুই লিখেছিস? এসব তুই কোথায় পেলি?' আবুল হোসেন জানালেন, এসব তাঁর মনে এসেছে, তাই লিখেছেন। চারুবাবু তাঁকে কাছে টেনে নিলেন। মাথায় হাত রেখে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'তুই লিখে যা। আমি আশীর্বাদ করছি, তুই খুব ভালো করবি।'

এর পরের ঘটনা আরও চমকপ্রদ। তত দিনে তাঁর সেরা বন্ধু হয়ে উঠেছেন গোলাম কুদ্দুস। তিনিও লেখেন। দুই বন্ধু মিলে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। আর কথা বলেন কবিতা নিয়ে। একদিন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি কবিতা লিখলেন আবুল হোসেন। শিরোনাম দিলেন 'হে ধরণীর কবি'। কাউকে না জানিয়ে-এমনকি কাছের বন্ধু গোলাম কুদ্দুসের কাছেও গোপন রেখে সেটি খামে ভরে পাঠিয়েও দিলেন রবিঠাকুরের উদ্দেশ্যে। যদি কবি খুলে পড়েন কবিতাটি। যদি কিছু লিখে জানান। কিন্তু চিঠিতো আর আসে না। একসময় আশা শেষ হয়ে যায়। তখনই অকস্মাৎ-চার মাস পরে তাঁর হাতে আসে ছোট্ট একটি চৌকো চিরকুট। চিরচেনা বিশিষ্ট হস্তাক্ষরে তাতে লেখা একটিমাত্র শব্দ- 'আশীর্বাদ'। তার নিচে সই: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই ছোট্ট চিরকুট তাঁর একটি নির্জন দুপুরকে চিরদিনের মতো সোনায় মুড়ে দিয়ে যায়। সেই থেকে আবুল হোসেনের নতুন জীবনের সূচনা। কুষ্টিয়ায় পড়ার সময়েই কলকাতার বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় কবিতা লিখেন তিনি। সেগুলি হলো- ফজলুল হক সেলবর্ষীর সম্পাদনায় 'দৈনিক তকবীর', চৌধুরী শামসুর রহমানের সাপ্তাহিক 'হানাফী', এস ওয়াজেদ আলির মাসিক 'গুলিস্তা' প্রভৃতি।

কবি আবুল হোসেন নিজেকে কিছুটা সৌভাগ্যবান মনে করেন। কারণ লেখা শুরু করার এক-দুই বছরের মধ্যেই তিনি উভয় সম্প্রদায়ের সেরা কাগজগুলিতে লিখতে পেরেছিলেন। পরিচয় হয় দুই সম্প্রদায়ের প্রধান কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদকদের সঙ্গে।

প্রথম যৌবনে যখন কবিতা লিখতেন আবুল হোসেন, তখন তার সবটাই হয়ে যেত রবীন্দ্রনাথের ধাঁচের। কলকাতায় আধুনিক কবিতার সংস্পর্শে এসে বুঝলেন, কবিতা হতে হবে অন্য রকম। আরও কিছুদিন পর উপলব্ধি করলেন, অন্যদের মতো করে লিখলেতো তাঁকে আলাদা করে চেনা যাবে না। এবার তিনি খুঁজতে শুরু করলেন নিজের এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। নিজের কণ্ঠস্বর রপ্ত করার সাধনায় আবুল হোসেন কবিতা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন বাড়তি সব রং, অযথা সব আবেগ। কবিতার ভাষাকে গড়াপেটার জন্য তিনি ধরতে চেয়েছেন পথচলতি মানুষের আটপৌরে শব্দ আর কথা বলার ভঙ্গি। মানুষের দৈনন্দিনের মুখের বুলি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন কবিতায়।

১৯৪০ সালে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'নব বসন্ত' প্রকাশ হওয়ার পর ১৯৬৯ সালে 'বিরস সংলাপ', ১৯৮২ সালে 'হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস', ১৯৮৫ সালে 'দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে', ১৯৯৭ সালে 'এখনও সময় আছে', ২০০০ সালে 'আর কিসের অপেক্ষা', ২০০৪ সালে 'রাজকাহিনী', ২০০৭ সালে 'আবুল হোসেনর ব্যঙ্গ কবিতা' ও গদ্যের বই 'দুঃস্বপ্নের কাল', ২০০৮ সালে 'প্রেমের কবিতা' ও 'কালের খাতায়', ২০০৯ সালে গদ্য 'স্বপ্ন ভঙ্গের পালা' বইগুলি প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুবাদ কবিতাগুলো হলো- 'ইকবালের কবিতা', 'আমার জন্মভূমি', 'অন্য ক্ষেতের ফসল'। ২০০০ সালে 'আমার এই ছোট ভুবন', ২০০৫ সালে 'আর এক ভুবন' নামে দুটি স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। 'অরণ্যের ডাক' তাঁর অনুবাদ উপন্যাস। 'পার্বত্যের পথে' নামক ভ্রমণ কাহিনীও লিখেছেন তিনি। এছাড়া তাঁর আরও অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে।

কবি আবুল হোসেন বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন- একুশে পদক, বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, জাতীয় কবিতা পুরস্কার, নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক, পদাবলী পুরস্কার, কাজী মাহবুবুল্লাহ পুরস্কার ও স্বর্ণপদক ও আবুল হাসানাৎ সাহিত্য পুরস্কার, জনবার্তা স্বর্ণপদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার।

আবুল হোসেন তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু কবিতার সাধনাকে কখনো দূরে ঠেলে দেননি তিনি। ■

লেখক : মৌরী তানিয়া